সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী,

অধ্যক্ষ,

শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়,

উত্তর ২৪ পরগনা, প.ব.।

সম্প্রীতি কথাটির অর্থ হল সমান প্রীতি; উভয় পক্ষের মধ্যে সমান ভালোবাসা ও একাত্মবোধের আকর্ষণ বল। প্রতিটি মানুষ কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য; সেটি ধর্মীয়, সামাজিক, জাতিগত, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সম্প্রদায় হতে পারে। ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের, সেই সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ বা ভালোবাসা থাকবে। কিন্তু ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টি, মানুষ হিসাবে সে বিশ্ব মানব সমাজের বা মানব-সম্প্রদায়েরও সদস্য। তাই, নিজের সংকীর্ণ, বংশগত সম্প্রদায়ের বাইরের বিশ্ব-মানব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বড়ো দায়িত্ব রয়েছে। ব্যক্তিকে এই দুটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। নিজের বংশগত সমাপ্রদায় এবং বিশ্ব-মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমান ভালোবাসা বা প্রীতি পোষণ ও প্রদর্শন করার নামই হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই ভারসাম্যের কম-বেশি হলেই ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক হয়ে পরেন; যেটিকে সাধারণভাবে মানব চরিত্রের একটি কলঙ্কিত দিক বলে ধরা হয়। কিন্তু দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির কম-বেশি জনিক ভারসাম্যের ঘাটতি দুইভাবে হতে পারে – (ক) নিজের সম্প্রদায়কে বেশি ভালোবাসা, তার উন্নতি-প্রগতির চেষ্টায় নিরত থাকা, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের কোনো ক্ষতি না করা। এটি ধনাত্মক অর্থে সাম্প্রদায়িকতা, এই সাম্প্রদায়িকতায় অপরাধ নয়, এর লালন ও প্রসার দরকার। (খ) অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে, নিজের সম্প্রদায়কে বড়ো করে দেখানোর চেষ্টা; অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ছড়িয়ে সর্বশান্ত করে নিজের সম্প্রদায়কে উপরে তুলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা। - এটি ঋনাত্মক সাম্প্রদায়িকতা, এতে সমাজ, দেশ, মানবতার অপুরোনীয় ক্ষতি হয়। সভ্যতার চাকা থমকে দাড়ায়, অনেক সময় কয়েকশো বছর পিছনেও চলে যায়। - এই সাম্প্রদায়িকতা তাই নিন্দনীয়। - কিন্তু দুর্ভাগ্যবসতঃ বর্তমান মানব সভ্যতা এই দ্বিতীয় প্রকাকরর ক্ষতিকারক সাম্প্রদায়িকতারই শিকার!

একটা ইমারতের গঠনগত উপাদান অসংখ্য ইট, পাথর, লোহা, সিমেন্ট ও বালির মধ্যে পরস্পরের প্রতি যতটা বেশি আকর্ষণ বা একাত্মবোধের বল কার্যকরি থাকবে ইমারতটি তত বেশি মজবুত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে; সেটি তত বেশি তীব্র থেকে তীব্রতর ঝড়-ঝাপ্টা, বন্যা, ভূমিকম্পের মোকাবিলা করতে পারবে। এরূপ মজবুত ইমারতে বসবাসকারিরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন না - নিশ্চিন্তে নিজেদের উন্নতি-প্রগতির কাজে মন দিতে পারেন – জীবন-সংগ্রামে, উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। লক্ষ্যণীয় যে, ইমারতের গঠনগত উপাদানগুলি কিন্তু একই রকমের

নয় – সেগুলির নাম থেকে চরিত্র, নিজস্ব ধর্ম, আকার-আকৃতি সবকিছুতেই বিস্তর বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ইমারতটির অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও সকল উপাদানগুলির সংঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য অভিন্ন। তাই, উপাদানগুলির সামগ্রিক সংঘবদ্ধ জীবনে সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনে যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে – তাই প্রতিটি উপাদান একে অপরের প্রতি তীব্র থেকে তীব্রতর আকর্ষণ বা একাত্বতা অনুভব করে। - মানুষের সমাজও ঠিক একইরূপ বিভিন্ন বিচিত্র নামের, বর্ণের, ধর্মের, চরিত্রের, আকার-আকৃতির মানুষের সমষ্টিগত, সংঘবদ্ধ ইমারত। সুতরাং, উপরোক্ত নিয়মেই সমাজের অস্তিত্ব, শান্তি ও প্রগতি প্রতক্ষ্যভাবে নির্ভর করে সমাজের গঠনগত উপাদান অর্থাৎ, মানুষগুলির মধ্যের পারস্পরিক আকর্ষণ অর্থাৎ ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও একাত্ববোধের মনোভাবের উপরে। যে সমাজের মানুষদের মধ্যে এই গুণাবলিগুলো আছে সে সমাজে সম্প্রীতি আছে। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে উপরোক্ত অর্থে প্রীতির মনোভাব ও আচরন। এই প্রীতি নামক আকর্ষণ বল নিয়ে আসে শান্তি; আর শান্তি নিয়ে আসে প্রগতি – যার পিছনে আধুকিন সভ্যতা ছুটছে।

কিন্তু সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকলে অত্যাচারী ও শোষকদের অসুবিধা। তাই, তাদের অসীম ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে বারে বারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরে আঘাত হানা হয়েছে। এই কাজে হয় সম্প্রতি-প্রিয় সাধারণ মানুষের জীবন-সম্পত্তি-উজ্জত-আব্রুর উপরে আক্রমণ হানা হয়েছে অথবা সম্প্রতির প্রবক্তা নেতৃত্বের উপরে। অস্ত্র হল - দাঙ্গা বা নাশকতামূলক ঘটনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম নাশকতামূলক ঘটনা ঘটে নাথুরাম গডসের দ্বারা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যার মাধ্যমে। এরপরে ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৮৩ সালের আসামের নেলীর মুসলিম গণহত্যা, ১৯৮৪ সালের শিখ-নিধণ যজ্ঞ, ১৯৮৯ সালের ভাগলপুরের হৃদয়-বিদারী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৯৯ সালে গ্রাহাম স্টেইন ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে গাড়ির মধ্রে পুড়িয়ে মারা, ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ শহীদ ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ২০০২ সালে গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা, ২০১৩-১৪তে আসামে ও উত্তর প্রদেশের মুজফফরনগর–শামলিতে মুসলিম বিতাড়ন দাঙ্গা, গরুর নামে-ধর্মের নামে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে অমানবিক নির্মমতায় পিটিয়ে মেরে ফেলা-সহ আরও অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণু অবস্থাকেই দর্শায়। সম্প্রীতির প্রবক্তাদের জীবননাশ শুধুমাত্র জাতির জনক গান্ধী হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি – তা বিরামহীনভাবে চলেছে এবং সাম্প্রতিককালে সেটার মাত্রা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে রোহিত ভেমুলা, নরেন্দ্র ধাবলকার, গোবিন্দ পান্সারে, এম.এম. কুলবার্গী, গৌরি লঙ্কেশ ইত্যাদি মহান ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জীবন দিয়েছেন - তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে নিতেই হয়। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক একতা ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে ভীত করতে "গো-রক্ষা" ও লাভ-যিহাদ"-এর ধুঁয়োর অন্ধকারে সাধারণ মানুষকে হত্যা ও ঘৃণা ছড়ানোর পরিকল্পিত নোংরা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ফলস্বরূপ, বহু সম্পত্তির যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনি অজস্রহ মানুষ জীবন ও সম্মান হারিয়েছেন;

শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বানিজ্য, সৃজনশীলতা স্তব্ধ হয়েছে; দেশের প্রগতিকে পিছনদিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা শুধুমাত্র এক ইতিহাস হলে এবং সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি বর্তমানকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে আজকে আর এই প্রবন্ধ লিখতে হতো না। বর্তমানে দেশের সাম্প্রদায়িক অবস্থা আগের চেয়ে কোনো অংশেই ভালো নয়, বরং দিন দিন খারাপ হচ্ছে। বলা ভালো খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেশে একের পর এক নাশকতামূলক ঘটনা উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর দ্বারা ঘটানো হচ্ছে এবং সেগুলির প্রস্তুতিস্বরূপ দেশের বিভিন্ন অংশে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রশিক্ষণের আয়োজনও করা হচ্ছে! বিষয়টি উদ্বেগের! কিন্তু আমরা, সুশীল-ভদ্র সমাজ অস্বাভাবিকভাবে নীরব! প্রশ্ন ওঠে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ ধর্মী- সম্প্রদায়ের / সংগঠনের যুবকেরা এই অস্ত্রগুলো কার /কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে? - মানসিকতা ভয়ঙ্কর, প্রবণতা ধ্বংসাত্মক! মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে গণমাধ্যম, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা-সিরিয়াল সবকিছুর মাধ্যমেই দেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরনের সচেতন প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালানো হচ্ছে। যিহাদ, লাভ-যিহাদ, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, জামাত, পাকিস্তান, দেশের সুরক্ষা, ইত্যাদি কথাগুলি গয়বেলিয় থিওরি অনুসারে হাজার – লক্ষবার সাধারণ মানুষের চেতনায়, মস্তিষ্কে, মজ্জায় প্রক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। এর ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এই কথাগুলি শুনলেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো ব্যক্তির স্বাভাবিক বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিলোপ ঘটে এবং কূচক্রিদের ফাঁদে পা দিয়ে দেয়। পরিণামস্বরূপ, দেশের মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, একতা, শান্তি বিঘ্নিত হয়। আর শান্তি ছাড়া প্রগতি আসতে পারে না। তাই আমাদের সভ্যতা পিছিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় – দেশ মাটি দিয়ে নয়, মানুষ দিয়ে তৈরি। তাই, যারা দেশের মানুষকে ঘৃণা করে, খুন করে আর তার মাটিকে পূজা করে - তারা দেশকে ভালোবাসে না। যারা দেশের মানুষের জন্য - বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল শোষীত মানুষদের কল্যাণে কাজ করে – তাঁরাই প্রকৃত দেশভক্ত। - বাকিরা ভন্ড। আমাদের অবস্থান এই ভন্ডামির বিরুদ্ধে, দেশের মানুষের পক্ষে।

ভন্ডরা যেহেতু দেশের সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দেশের সর্বনাশ করতে চায়; তাই সাধারণ মানুষকে সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা আমাদের, দেশভক্তদের দায়িত্ব। সমাজে সম্প্রীতি নষ্টের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। বনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী শাসকদের উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের উপরে আর্থিক শোষণের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে চলা এবং তাদের এই চালাকি যাতে লোকে ধরতে না পারেন তার জন্য জনগণকে ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের দ্বারা ভাতৃ-দাঙ্গার জীবন-মরণ সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত রাখা।

দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সমাজে ভাতৃত্ব, মৈত্রি, একতা ও শান্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রশাসনের, গণমাধ্যমের, রাজনৈতিক দলগুলির এবং সচেতন নাগরিকবৃন্দের। বর্তমান অশুভ যোগসাজোসের খপ্পড় থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং সমাজে একতা ও শান্তির পরিবেশ

নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশকে প্রকৃত প্রগতির পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা ও লালনে সকলকে আহ্বান জানায়।